প্রথম অধ্যায়
সাহিত্যতত্ত্ব , ভাষা ও ছন্দ

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনার যে প্রধান তিনটি বিভাগ— সাহিত্যতত্ত্ব , ভাষা ও ছন্দ তার সবকটিরই, শেষ দশকে (১৯৩০-৪১) রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রসঙ্গে উত্থাপন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু যে সাহিত্য সমালোচনা দিয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনার আরম্ভ করেন (ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী, ১৮৭৫) ১৯০৬ সালে 'শুভবিবাহ' (বঙ্গদর্শন আষাঢ় ১৩১৩) প্রবন্ধটি তার শেষ নিদর্শন। এরপর আর তথাকথিত সমালোচনা প্রবন্ধ তিনি লেখেন নি। এই সময় ১৯০৭ সালে একটি মাত্র সাহিত্যপ্রবন্ধ 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রকাশিত হয় এরপর দীর্ঘ সাত বছর নীরবতার পরে সবুজপত্রের শ্রাবণ সংখ্যায় বাস্তব প্রবন্ধটি থেকে আবার সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার জোয়ার এল। এ প্রসঙ্গে সবুজপত্র পত্রিকার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার পূর্বে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্য' নামে সংকলিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্যতত্ত্ব প্রবন্ধগুলির আলোচনা ও এই দশকের (১৯০১-১৯১১) অন্যান্য সাহিত্য প্রবন্ধগুলির কথাও বলা আবশ্যক।

ভূমিকা অংশে সংক্ষেপে দেখিয়েছি যে শান্তিনিকেতনে প্রবাসের প্রথম দশটি বছর আশ্রমগুরুর ছিল সাধনার সময়। 'বঙ্গদর্শন' তখন তাঁর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব তাই ধারাবাহিক উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ছোটো ছোটো রচনা। ১৯০৩ সালে বঙ্গদর্শনের চাহিদা পূরণ করতে লিখলেন 'সাহিত্যের বিচারক', 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সাহিত্যের তাৎপর্য' । ইতিপূর্বে ১৮৯২ সালে বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে ডিবেট হয় কিন্তু পত্রের মাধ্যমে, বিষয় ছিল সাহিত্যতত্ত্ব। এর মধ্যে 'মানব প্রকাশ' প্রবন্ধটির জের টেনে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ এই পরবর্তী প্রবন্ধগুলির রচনায়।

এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে,'আমাদের মনের দুটো অংশ, একটা আমার নিজত্ব, একটা আমার মানবত্ব, লেখকের যে মন সৃষ্টি করে তা তার নিজত্ব না, তা তার প্রতিভা। এই প্রতিভা দিয়ে সাহিত্যিক বাইরের সাধারণের জগৎকে আপন হৃদয়ের রসে জারিত করে রূপ দেয়। সাহিত্যিকদের রচনানৈপুণ্য তা আবার সাধারণের জগৎ হয়ে ওঠে। তাহলে 'একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে' (১)

বিংশ শতাব্দীর সেটা একেবারে প্রারম্ভ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য বিষয়ীর আত্মতা ছেড়ে বিষয়ের আত্মতার পরিধিতে চলে আসার কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে যে আলোচনা করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে বিষয়ীর আত্মতার ধারণাটিকেই তিনি সাহিত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 'আধুনিক কবি' প্রবন্ধের যে ব্যাখ্যা তা তখনও ভবিষ্যতের আওতায়। " কাব্যে বিষয়ীর আত্মাতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ীর আত্মতা। এইজন্যে কাব্য বস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেন না অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্য। বিষয়টিকে অবশ্য তিনি বিস্তৃত ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন— 'দুয়ের (নিজত্ব ও মানবত্ব) কার্যপ্রনালী প্রায় একইরকম। ··· মন সাধারণত

প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে, সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে। মনের জিনিসকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষভাবে সৃজনশক্তির আবশ্যক হয়। এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে তাহা অনুকরণ হইতে দূরবর্তী।

'অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানব মন নাম দিলে ক্ষতি নেই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিস সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানবমন পুনশ্চ নিজের জিনিস নির্বাচন করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।' (৩)

বিষয়ীর মন, তাকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, তা তার সৃষ্টির সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে একথা রবীন্দ্রনাথ নানান উদাহরণের সাহায্যে সমসাময়িক প্রবন্ধগুলিতে কেবল আলোচনা না করে দাবি করেছেন। আবার রচনাগুলির গভীরতর বিশ্লেষণে অগ্রসর হলে প্রবন্ধকারের ব্যাখ্যায় একটা নৈতিক দায়িত্বের গুরুভার ছায়া ফেলেছে লক্ষ করা যায়। যেমন সৌন্দর্যবোধ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে একে অপরের অবশ্যম্ভাবী শর্তরূপে গ্রহণ করেছেন।

' পৌষ্য রাজা ঋষিকুমার উতঙ্ককে কহিলেন, যাও অন্তঃপুরে যাও, সেখানে মহিষীকে দেখিতে পাইবে। উতঙ্ক অন্তঃপুরে গেলেন, কিন্তু মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। অশুচি হইয়া কেহ সতীকে দেখিতে পায় না; উতঙ্ক তখন অশুচি ছিলেন।

' বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের সমস্ত মহিমার অন্তঃপুরে যে সতীলক্ষ্মী বিরাজ করিতেছে তিনিও আমাদের সম্মুখেই আছেন, কিন্তু শুচি না হইলে দেখিতে পাইব না, যখন বিলাসে হাবুডুবু খাই, ভোগের নেশায় মাতিয়া বেড়াই, তখন বিশ্বজগতের আলোকবসনা সতীলক্ষী আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধান করেন।' (৪) রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণের পেছনে রয়েছে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আশ্রমগুরু মনোভূমি। এখন আর তাঁর ভাবভূমি কেবল নান্দনিক নয়, মূলত নৈতিক। তাই কালিদাসের কাব্যনাটকাদি বুঝতে গেলে তাঁর মঙ্গল আদর্শকে উপেক্ষা করলে চলবে না। 'ততঃকিম্' (১৯০৬) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এরই পুনরাবৃত্তি করেছেন—

' সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি, এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।'

এবারে আসি পাঠকের প্রসঙ্গে। সাহিত্যকার তাঁর সৃষ্টি পরোক্ষভাবে উৎসর্গ করেন পাঠককে। পাঠকের মধ্যে দিয়েই স্রষ্টার প্রয়াস সার্থক হয়ে ওঠে। 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবেন্ধ তিনি এ প্রসঙ্গ উল্লেখমাত্র করেছেন— ' লেখকদের মধ্যে কেহ বা বন্ধুকে, কেহ বা সম্প্রদায়কে, কেহ বা সমাজকে , কেহ বা সর্বকালের মানবকে আপনার কথা শুনাইতে চাহিয়াছেন। ··· এমনি করিয়া সাহিত্য কেবল লেখকের নহে, যাহাদের জন্য লিখিত তাহাদেরও পরিচয় বহন করে ।' (৫) অর্থাৎ ' একেবারে খাঁটি ভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে' ব্যাস এই টুকুই কিন্তু পাঠকের

অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সার্থক অংশগ্রহণ যে কবির কাব্যকে কালোত্তীর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠা করে এই মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতার পরিণাম। এই পর্বে তা খুব স্পষ্ট ও ব্যাপকভাবে সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্র জুড়ে নেই। একথা বলতে বাধা নেই আদিকবির (ভবভূতি) অনুভূতিতে জানতে পারি যে এ এক নিষ্ঠুর উপলব্ধি যখন অরসিকের কাছে কাব্য উপস্থাপিত করতে হয়। তার চেয়ে ভালো যুগ যুগ অপেক্ষায় থাকা সেই পাঠকের পথ চেয়ে যে প্রতিদিনের প্রয়োজনের মলিনতা ছেড়ে সাহিত্যের রসগ্রহনে উৎসাহী—

' অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।'

পাঠকের তরফ থেকে সাহিত্যের স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের সাহিত্যতত্ত্বের প্রবন্ধগুলির কেন্দ্রীয় চিন্তা রূপে গৃহীত হয়েছে।

এই দশকে এরপর আর কোনো সাহিত্যতাত্ত্বিক আলোচনার লিখিত পরিচয় মেলে না সুতরাং পূর্বে উল্লেখ্য সবুজপত্র পর্বে এবার চলে যেতে পারি। 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক বিরাট সম্মান, তাঁর নোবেল পুরস্কার লাভ। ইতিমধ্যে জীবনের পঞ্চাশতম জন্মদিন পালিত হয়েছে সেই সঙ্গে বিলাত প্রবাস তাঁকে আভাসিত করেছে সমগ্র বিশ্বের সংকটের দিন আসন্ন। মানব সভ্যতার নখদন্ত বর্বরতা প্রকাশ হবার দেরি নেই। এক বছর সাড়ে চার মাসের ইংল্যান্ড ও আমেরিকা সফরে পাশ্চাত্যকে এবারে তিনি দিয়ে এলেন প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা, প্রশান্তি ও প্রেমভক্তির বাণী Sadhana এবং Song offerings আর সঙ্গে নিয়ে এলেন যৌবনের বেগ, নতুন এক উজ্জীবনের বাণী। ঠিক সেই মন্ত্র প্রকাশের সুযোগ ঘটে গেল প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' পত্রিকায়। সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে পুরাতনের জড়তাকে ঝেড়ে ফেলে অদম্য যৌবনের উচ্চকণ্ঠ আহ্বান যে পালাবদলের সূচনা করেছিল তাকেই ব্যঙ্গের হালকাসুরে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিলেন বীরবল তাঁর সবুজপত্রের মাধ্যমে। তাই চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার দাবি জানালেন রচয়িতাদের কাছে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রকাশিত হল প্রথম সংখ্যা ২৫ শে বৈশাখ ১৯১৪। রবীন্দ্রনাথের রুদ্ধ আবেগ যেন মুক্তি পেল এতদিনে। একই সঙ্গে প্রথম সংখ্যায় লিখলেন 'সবুজের অভিযান' কবিতা, 'হালদার গোষ্ঠী' ছোটোগল্প ও 'বিবেচনা অবিবেচনা' প্রবন্ধ (কালান্তর)। সবুজপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠল—

ওই যে প্রবীণ ওই যে পরম পাকা
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়
.....
চিরযুবা তুই যে চিরজীবী

জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে

প্রাণ অফুরাণ ছড়িয়ে দেদার দিবি।

সবুজনেশায় ভোর করেছিস ধরা,

ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ-ভরা

বসন্তেরে পরাস আকুল করা

আপন গলার বকুল-মালারগাছা।

আয়রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা।' (৬)

সবুজপত্রের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ 'বাস্তব' (১৯১৪) দীর্ঘ সাত বছরের নীরবতার পর। এর মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা রবীন্দ্রজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর রচনা শক্তির দুর্বলতা ও দোষত্রুটি নিয়ে তখন চলেছে তুমুল বিতর্ক। রবীন্দ্র-রচনার প্রথম ও প্রধান দুর্বলতা বাস্তবতার অভাব। বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে এই দাবি জোরদার হয়ে উঠল অন্যদিকে অজিতকুমার চক্রবর্তীও যুক্তিখন্ডনের ভার নিলেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। এই সময়ে বিদেশ ভ্রমণ শেষ করে রবীন্দ্রনাথ ফিরেছেন ও সবুজপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্যে যে পালাবদলের ইঙ্গিত সূচিত হয়েছে তাকে তত্ত্বের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে আরও নির্দিষ্ট করে তুলতে লিখলেন 'বাস্তব' প্রবন্ধ।

এই প্রবন্ধে সবথেকে আগে যেটা নজরে পড়ে তা হল নৈতিকতার ভার মুক্তি। 'লোক যদি সাহিত্য হতে শিক্ষা পেতে চেষ্টা করে তবে পেতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোকশিক্ষা দেবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল মাষ্টারির ভার নেয় নি।'(৭) বাস্তব শব্দটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে অর্থে প্রযুক্ত হয় তা ঠিক দৈনন্দিন প্রয়োজনের প্রয়োগের সঙ্গে সমান নয়। 'মুশকিল এই যে, বস্তু একটা নয় এবং সব জায়গায় আমরা একই বস্তুর তত্ত্ব করিনে। মানুষের বহুধা প্রকৃতি, তার প্রয়োজন নানা এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাকে ফিরতে হয়।

'এখন কথা এই, সাহিত্যের মধ্যে কোন্ বস্তুকে আমরা খুঁজি। ওস্তাদেরা বলে থাকেন সেটা রস-বস্তু '(৮) এই বাস্তবের অবশ্যম্ভাবী শর্ত হয়ে এল পাঠকের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রসঙ্গ। সাহিত্য বাস্তবতার উপস্থিতি ও তার সার্থক ব্যবহার বিচারের দায়িত্ব অনেকখানি পাঠকের ওপর কিন্তু সেখানেই স্রষ্টার বিপদ। প্রবন্ধকার বলেছেন— 'কবি রাগই করুন আর খুশিই হউন তাঁর কাব্যের একটা বিচার করতেই হবে— এবং যে-কেউ তাঁর কাব্য পড়বে সকলেই তাঁর বিচার করবে— সে বিচারে সকলে একমত হবে না। মোটের উপরে যদি নিজের মনে তিনি যথার্থ আত্মপ্রসাদ পেয়ে থাকেন তবে তাঁর প্রাপ্যটি হাতে হাতে চুকিয়ে নিয়েছেন। অবশ্য পাওনার চেয়ে উপরি-পাওনায় মানুষের লোভ বেশি। সেইজন্যেই বাইরে আশে-পাশে আড়ালে-আবডালে এত করে হাত পাততে হয়। ঐখানেই বিপদ।'(৯) সুতরাং পাঠক থাকলেও তাকে বিচারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করতে রবীন্দ্রনাথ নারাজ।

এর পরবর্তী পর্যায়ের শুরু ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত ভাষণ সাহিত্য, তথ্য ও সত্য এবং

সৃষ্টি এই তিনটি প্রবন্ধ দিয়ে। ১৯৩৬ সালে 'সাহিত্যের পথে' পুস্তিকার প্রবন্ধগুলি এই সময়ের রচনা থেকে সংকলিত হয়েছে। যেহেতু ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ আমাদের আলোচ্য সময় সেহেতু 'সাহিত্যের পথে'র অন্তর্গত ১৯৩০ -এর পূর্বের প্রবন্ধগুলির একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত দ্বিতীয় ভাষণটির নাম 'তথ্য ও সত্য'। এখানে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় সাহিত্যে বাস্তবতার প্রসঙ্গটিকে উত্থাপিত করেছেন ও অত্যন্ত সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিবাহ-উৎসবের দিনে বাঁশি সাধারণ একটি ছেলে এবং সাধারণ একটি মেয়ের উপর থেকে সামান্যতর কুহেলিকা সরিয়ে দিয়ে বর এবং কনেকে তাদের অনন্যতায়, তাদের অসামান্যতায় দেখিয়ে দেয়। ওই সামান্যতাই ছদ্মবেশ, অসামান্যতাই সত্য রূপ। ঠিক একই রকম ভাবে ঘটনার তুচ্ছতার ছদ্মবেশ মোচন করে সাহিত্য তাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রকৃতির মূল্যহীন বস্তু, যাকে রবীন্দ্রনাথ তথ্য নামে অভিহিত করেছেন, স্রষ্টার প্রতিভার স্পর্শে সাহিত্যের যে রূপ লাভ করে তাকেই সত্য রূপে স্বীকৃতি দিতে চান রবীন্দ্রনাথ। সে সত্য তখন বাস্তবের মলিনতার গ্লানি মুছে ফেলে এক অনির্বচনীয় সৌকর্য লাভ করে। সে সত্যে নাই বা থাকল বস্তুর নিখুঁত অনুকরণ।

' সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা-সব সত্য নয়। কবি
তব মনোভূমি রামের জনমস্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' (১০)

১৯২৭ সালে 'সাহিত্যধর্ম' ও 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ দুটি লেখেন। আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে মতবিরোধ চলতেই থাকে। রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই সাহিত্যের নির্বিচার বিষয় নির্বাচন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের আধুনিকতার নামে অকারণ শালীনতার সীমা লঙ্ঘনকে প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিলেন না। ' সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখনকার কেউ কেউ মনে করছেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেটাই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।'(১১)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে তখন আধুনিকতার প্রবল দাবিদার কল্লোল, কালিকলম, প্রগতির লেখকগোষ্ঠীও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় শুচিবায়ুগ্রস্থতার অভিযোগ দেখাতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ এদের বারবার একাধিক প্রবন্ধে বোঝাতে চেয়েছেন আধুনিকত্ব মানেই মূল্যবান না। সাহিত্যের চিরকালীন ধর্মকে লঙ্ঘন করলে তা কখনই যথার্থ সাহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে না। ওটা কেবল সাময়িক উন্মত্ততা, চিরকালীন আবেদন ওতে নেই। এই বিরোধ আরও অনেকদিন পর্যন্ত চলেছে, বস্তুত রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ অবধি এই অভিযোগ মুক্তি ঘটেনি। কিন্তু এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক কাব্য' (১৯৩২) প্রবন্ধটি তাঁর শেষ নির্দিষ্ট পরিণত ও মননির্ভর বিশ্লেষণ বলা চলে এর পরে আর এ প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো ব্যাখ্যা করেন নি। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করব।

এই প্রবন্ধ দুটি প্রকাশের ফলে সাহিত্যমহলে তুমুল মতবিরোধ শুরু হয় ফলে রবীন্দ্রনাথকেই সভাপতি নিযুক্ত করে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে সনাতন পন্থী ও আধুনিকদল সভার আয়োজন করল। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ সালে 'সাহিত্যরূপ' ও 'সাহিত্য সমালোচনা' ভাষণ দুটি দেন এই সভায়। এখানে নতুন কোনো বিষয়ের অবতারণা তিনি করেন নি। পূর্বের যুক্তিগুলিকেই তিনি প্রকৃতির থেকে নেওয়া উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন মাত্র।

১৯২৯ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদ সভায় প্রদত্ত ভাষণ 'সাহিত্য বিচার' প্রবন্ধটি। এখানেও সাহিত্যের বিষয়টির শ্রেণীগত বিচার উচিত কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি পূর্বের জের টেনেই বলেছেন যে বিষয়টির শ্রেণীবিচার বিবেচ্য নয়। বিষয়টি রচয়িতার গুণে রসরূপের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

এই সভায় অন্য প্রশ্ন ছিল সাহিত্য বিচারে বিশ্লেষণ পদ্ধতির মূল্য কতখানি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বললেন— '··· উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না। সমগ্র সৃষ্টি আপন সমস্ত অংশের চেয়ে অনেক বেশি। সেই বেশিটুকু পরিমাণগত নয়। তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, সেটা হল রূপ, রহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেটাই হল অদ্বৈত, বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত, অথচ বহুর দ্বারা তার পরিমাপ হয় না। সে সকল অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্কল, তাকে অংশে খন্ডিত করলেই সে থাকে না। অতএব সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে। ··· সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়।' (১২) সাহিত্যের এই ঐক্যের প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ আলোচনায় আনেন নি। পরবর্তী পর্বে এই বিষয়টিকে অন্যতম হয়ে উঠতে দেখব।

এবার আমরা আমাদের মূল আলোচনায় যাব। ১৯৩০-১৯৪১ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক রচনাগুলির সূত্র হিসাবে এ পর্যন্ত তাঁর পূর্ববর্তী বিষয় সম্পর্কিত রচনাগুলি আলোচনা আবশ্যক ছিল।

পর্ব-এক

সাহিত্যতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার সুবিধার্থে একেবারে গোড়াতেই রবীন্দ্রপ্রবন্ধের পরিণত দশকটির সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক রচনাগুলির ছবিটা একটু স্পষ্ট করে নিই। সাহিত্যের পথের অন্তর্গত সাতটি প্রবন্ধ।

রূপকার ১৯৩১, আধুনিক কাব্য ১৯৩২, সাহিত্যতত্ত্ব ১৯৩৩, সাহিত্যের তাৎপর্য ১৯৩৪, বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ১৯৩৪, উৎসর্গ(পত্র) ১৯৩৬, রূপশিল্প (সংযোজন) ১৯৩৯ এবং সাহিত্যের স্বরূপ পুস্তিকার অন্তর্গত সব (১১টি) প্রবন্ধগুলি।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রথম জীবনে সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ের অবতারনা করেছেন। কিন্তু সরাসরি সাহিত্যতত্ত্বালোচনার সূত্রপাত হলো 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' ভারতী ও বালক পত্রিকায় ১৯০৭। ১৯০৭ সালে 'সাহিত্য' নাম নিয়ে প্রথম সম্পূর্ণ তত্ত্ব প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হলো। এরপর দীর্ঘ ১৫/১৬ বছরের ছেদ

10735

পড়ল। এর মাঝখানে রূপ ও অরূপ (১৯১১), বাস্তব (১৯১৪), কবির কৈফিয়ত (১৯১৪) প্রধানত ক'খানি রচনা লক্ষণীয়। এরপর আবার জোয়ার এল ১৯২৪ সালে। সাহিত্যের পথের প্রবন্ধগুলি রচিত হতে লাগল। সেই সঙ্গে অভিভাষণ, চিঠিপত্র, প্রভৃতিতেও চলল বিশ্বকবির সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তাচেতনার প্রতিফলন। ১৯৪১ সালে কবিতা পত্রিকায় 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' তাঁর মৃত্যুর দু'মাস পরে প্রকাশিত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত শেষ প্রবন্ধ। অবশ্য এটি রচিত হয় ১৯৪১-এর মে মাসে। রবীন্দ্রনাথের লেখা শেষ সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ 'সত্য ও বাস্তব' এটি ১৯৪১-এর জুন মাসে রচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশকের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে একটা বিশেষ ধরনের রচনারীতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল— প্রতিবাদী রীতি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী? সাহিত্যের স্বরূপ কী? সাহিত্য বিচারের রীতিই বা কী? এ সব প্রশ্নের উত্তর তিনি যে ইতিপূর্বে বিশ্লেষণ করেন নি তা নয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিকতার জোয়ারে যখন নতুন পলির সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের আবদ্ধনোংরা জল দু'কূল ছাপিয়ে বইতে শুরু করল তখন রবীন্দ্রনাথ একরকম জোর করেই সাহিত্যের মানরক্ষার খাতিরে কিছুটা কঠোর হয়ে উঠেছিলেন। সাহিত্যে আধুনিকতা প্রদর্শনের দাবিতে যে শ্লীলতা লঙ্ঘনের প্রয়াস দেখা দিল তার ফল স্বরূপ রবীন্দ্রসাহিত্যে লাগল শুচিবায়ুগ্রস্থতার অভিযোগ। তিনসঙ্গীর ছোটোগল্পগুলিও তাঁদের নজরে এল না।

'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেএকটা প্রবল অভিযোগ ছিল যে তিনি সাহিত্যের বিষয় নির্বাচনে বাস্তববাদী নন। ক্রমশ দেখা গেল এই বাস্তবতার অভিযোগ আধুনিকতার সঙ্গে মিশে সনাতনপন্থী বলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে অভিযুক্ত করা হলো। রবীন্দ্রনাথ বললেন কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়কে বিশেষ যুগকে আধুনিক বলা হয় না। আধুনিক বা মডারন শব্দটি কোনো সময়সীমায় আবদ্ধ নয়। আজ যাকে আধুনিক বলছি পরে সেটাই হবে প্রবীন যেমন করে মধুসূদনের আধুনিকতা আজকের সময়ে সনাতন হয়ে গেছে। তবে সমসাময়িক যাকে ইংরাজিতে contemporary বলা হয় শব্দটি সব যুগের আধুনিকতার লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করে রাখে। ঈশ্বরগুপ্ত বা মধুসূদন যে তাঁদের সমসাময়িকদের মধ্যে আধুনিক লক্ষণে চিহ্নিত তা যে কোনো পাঠকের কাছে স্পষ্ট।

' নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয় মর্জি নিয়ে।

'বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক বলে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্ণস থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে এক সঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিল। যথা ওয়াড্‌সওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, কীট্‌স্।

কবি বার্ণসের পরে ইংরেজি কব্যে যে যুগ এল যে যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জি এসে উপস্থিত।

' তখনকার কালে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে, ব্যক্তিগত খুশির দৌড়।'(১৩)

যুগে যুগে সাহিত্যের এই পালাবদল তার নতুন নতুন লক্ষণ নিয়ে হাজির হয় পাঠকের দরবার সেটাকে চিহ্নিত করার জন্যেই পাঠক নাম দেয় আধুনিক অর্থাৎ এ যুগের। কিন্তু এ যুগের সাহিত্যে যে লক্ষ্মণগুলো স্পষ্ট প্রকাশিত হতে দেখা গেল তার মধ্যে বিষয়ের আত্মতা, নিরাসক্ত বাস্তব দৃষ্টি, একনিষ্ঠ বিজ্ঞানমন, মননশীল বিশ্লেষণ এসবগুলিকেই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজভাবে সাহিত্যে আপন করে নিয়েছেন। বস্তুত পক্ষে এ ঠিক এ যুগের নয় যে কোনো শাশ্বত সাহিত্যের মূল্য বিচারের মাপকাঠিই হল এই লক্ষণগুলি।

রবীন্দ্রনাথের যে প্রতিবাদ তা আধুনিকতার বিরুদ্ধে না আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যে আধুনিকতার যে বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া ও অসুস্থ ব্যবহার করা হচ্ছে তাকেই তিনি নিন্দা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিপ্রিয় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছেন— 'সাহিত্যে thought জিনিসটা উপাদান, কিন্তু রচনা তাকে ছাড়িয়ে যদি যায় তবেই বাঁচোয়া। · · · তোমাদের মন বেশি চিন্তা করে এবং চিন্তার বিষয়গুলির'পরে তোমাদের অত্যন্ত মমতা। · · · অনেককাল আগে ইংলন্ডে একজন লেখক শেলির প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, কবি জাতটাই নির্বোধ। · · · আসলসাহিত্যে বুদ্ধির সঙ্গে অনেকখানি পরিমানে অবুদ্ধি থাকা চাই। · · · তোমরা বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছ তাই ভাবনা ভুলিয়ে খুশি করবার দিকে তোমাদের ঝোঁক নেই।'(১৪) আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে এই অনেক জানার একসঙ্গে প্রকাশকরার তাগিদ দেখা যায়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ফ্রয়েড এর তত্ত্ব সাহিত্যের যথার্থ প্রয়োজন অতিক্রম করে সাহিত্যিকের জ্ঞানের সীমার নির্দেশ দেয়। একেও এক ধরণের বিষয়ীর আত্মতাই বলা যেতে পারে। ' আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক-বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ। এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই।'(১৫) রবীন্দ্রসাহিত্যে আধুনিকতা ও আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে এই বাদ বিবাদ আরও বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলএবং এর মীমাংসা অর্থাৎ আধুনিকতার নির্দিষ্ট কোনো সীমা নির্ধারণ হয় নি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি— 'এই রসটা এমন জিনিস যাহার বাস্তবতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায় এবং এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ ভূমিসাৎ হইলেও মীমাংসা হয় না।'(১৬)

১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষা পরিচয়(২) প্রবন্ধটি লেখেন। এই প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ আরও একবার সাহিত্যে বাস্তবতাকে সাহিত্যের সত্য বলে প্রমাণ করেছেন। একই সঙ্গে এবার তিনি মানবজীবনের সমগ্রতার সঙ্গে শিল্পের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বললেন। মানুষকে বাদ দিয়ে কেবল শিল্পের জন্যেই শিল্পের সৃষ্টি এই ধারণা অবান্তর বলে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন।

' · · · সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালো মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থা ভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হতে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জর

স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। · · · সেই রকম কোনো জাতির আত্মঘাতী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে তখন তার সাহিত্যে, তার শিল্পে, কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ নির্দেশ করে রসবিলাসীরা অহংকার করে তারা মানুষের শত্রু। কেননা সাহিত্যকে শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।'(১৭)

শিল্পে সাহিত্যে মনুষ্যত্বের এই একান্ত অবস্থিতি রবীন্দ্রনাথের এই দশকের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ জীবনের কোথাও কখনও আধুনিকতাকে অস্বীকার করেন নি। আধুনিকতার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ যে মানব-ভাবনা তাঁর শেষ দশকের সাহিত্য চিন্তার সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক প্রকাশিত হয় ১৯২৬ - এ। এই নাটকে তিনি যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে মানবশক্তির বিদ্রোহের সূচনা ইঙ্গিত করেছেন। আর ১৯৩২ সালে যখন 'কালের যাত্রা' প্রকাশিত হল তখন সেখানে প্রত্যক্ষ করলাম মানবতার বিজয়। মহাকালের নিয়ন্ত্রন গতি পায় যন্ত্রবৎ পুরোহিতের হাতে নয়, একেবারে ঈশ্বরের একনিষ্ঠ ভক্ত শূদ্রশ্রেণীর হাতে।

রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের সাহিত্যতত্ত্বে পাঠকের স্থান বেশ পাকা রকমের হয়ে উঠেছে। যে বিশ্বপ্রকৃতি কবির মনে প্রবেশ করে হৃদয়ের রসে জারিত হয়ে সাহিত্যের রূপ লাভ করল তার ছাপার আকারে প্রকাশেই সৃষ্টির ক্রিয়া সম্পূর্ণ হলো না। এবার তার গতি পাঠকের হৃদয়ে চিরকালের আসন লাভ করে 'বাঃ সুন্দর' বলে প্রশংসিত হলো তখন হলো তার সার্থক জন্ম। 'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা রূপে উদ্ধৃত অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা কবির পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ একে ভুল সংশোধন বলে চিহ্নিত করেছেন। ' এতদিন যা উল্টো করে বলেছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলতুম সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।'(১৮) তাহলে বস্তু সুন্দর বলে সাহিত্যে আসছে না। আসলে সাহিত্যে স্থান পাবার পর তার সৌন্দর্য নিরূপিত হয়। কবি বাইরের যে কোনো বিষয়কে আপন হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে প্রকাশ করেন। এবার তা পাঠকের হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি জাগায় ও তাকে অভিহিত করে সুন্দর বলে।

এখন প্রশ্ন হল পাঠকের হৃদয়ে যাকে সুন্দর বলে অর্থাৎ যা সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে ওঠে তার সঙ্গে বাস্তব জগতের সৌন্দর্যের দূরত্ব অনেক সময় থেকে যায় কেন। যেমন সাহিত্যের একাধিক চরিত্র ও ঘটনা পাঠককে কাঁদায় তবু সে তাকে সুন্দর বলে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন— ' দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতে পারতুম সুন্দর । দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে— সেই ভূমৈব সুখম। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্মঅভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্য এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়, আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে।' (১৯) তাহলে দেখা যাচ্ছে লেখক যেমন তার সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে অনুভব করে

তেমনি করেই পাঠকও তার চৈতন্যের অতলে উপলব্ধি করে এক নিবিড় অস্মিতাবোধ তাই সেও বলে সুন্দর। এই ভাবেই যুগ যুগ ধরে করুণরসের কাহিনী শ্রোতাদের কাঁদিয়েছে তবু সে বার বার সেই কাহিনী শুনেছে ও কেঁদেছে। কারণ সেই কাহিনীতে সে নিজেকে পেয়েছে গভীর ভাবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন ও সাহিত্যের পরিণত পর্বে মানবভাবনার দিকটিকে অত্যন্ত মুখ্য করে তুলেছিলেন একথা অনস্বীকার্য কিন্তু আধুনিক যুগের সমস্যা ও প্রতিকূলতার প্রয়োজনে মানুষের প্রকৃতির ঘটেছে বহুল পরিবর্তন। আধুনিক মানুষ স্বভাবতই তার সমস্যা পূরণ করতে চায় বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রণালী ও বিশ্লেষণাত্মক প্রবৃত্তির সাহায্যে। ফলত তার মননবস্তু জমে উঠেছে বিচিত্র রূপে ও প্রভূত পরিমানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, মানুষের জীবনের ও মনস্তত্ত্বের জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে সকল অনভিপ্রেত বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে তাকে সাহিত্যের পরিধিতে স্থান দিতে নারাজ। একে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বলছেন না এমন নয় কিন্তু তাঁর মনে এগুলি সাময়িক। সাহিত্যের শাশ্বত দাবি পূরণ করার ক্ষমতা এদের নেই। ' একদিকে বিরাট যন্ত্রশক্তি উদ্‌গার করছে অপরিমিত বস্তুপিন্ড , অন্যদিকে মলিনতা ও কঠোরতা শব্দে, গন্ধে, দৃশ্যে স্তূপে স্তূপে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। এর প্রবলত্ব ও বৃহত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারখানাঘরের সেই প্রবলত্ব ও বৃহত্ব সাহিত্যে দেখা দিয়েছে উপন্যাসে, তার ভূরি ভূরি আনুষঙ্গিকতা নিয়ে। ভালো লাগুক মন্দ লাগুক, আধুনিক সভ্যতা আপন কারখানা-হাটের জন্যে সুপরিমিত স্থান নির্দেশ করতে পারছে না। এই অপ্রাণপদার্থ বহু শাখায় একত্র হয়ে উঠে প্রাণের আশ্রয়কে দিচ্ছে কোনঠাসা করে। উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে। বলতে পার বর্তমানে এটা অপরিহার্য, তাই বলে বলতে পার না, এটা সাহিত্য।'(২০)

সুতরাং সাহিত্যের বিষয় হয়ে যে মানুষ আসবে তার হবে চিরকালীন সজীব মানবস্বভাব। সমসাময়িক কালের যে সাময়িক দুর্বলতাগুলি তার অতিপ্রয়োগ যেন সৃষ্ট চরিত্রের স্বাভাবিক সজীবতাকে গ্রাস না করে। তাহলে সেই চরিত্র ও সেই সাহিত্য সময়ের গন্ডীকে অতিক্রম করে শাশ্বত হয়ে উঠে না। আধুনিক সাহিত্যরচয়িতাদের মধ্যে এই সাময়িক উন্মাদনা প্রবল হয়ে যুক্তিবাদ, চিন্তাশীলতা, একান্তমনন নির্ভরতা প্রকৃত সাহিত্য বিষয়কে গ্রাস করেছে। রবীন্দ্রনাথ আত্মসমালোচনা দ্বারা বিষয়টিকে সহজ করে তুলে ধরেছেন— ' আমার এই দুটি নভেল (গোরা, ঘরে বাইরে) মনস্তত্ত্ব রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা আছে, সে কথা কবুল করতেই হবে। সাহিত্যের তরফ থেকে বিচার করতে হলে দেখা চাই যে, সেগুলি জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে। ··· গোরা গল্পের তর্কের বিষয় যদি ঝুড়িতে করে রাখা হয়ে থাকে তবে সেই বিষয়গুলির দাম যতই হোক-না, সে নিন্দনীয়।' (২১)

আবার এই মানবচেতনাই আশ্রয় করে আছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সত্য। আমরা জানি সাহিত্যে সত্য মঙ্গল ও সৌন্দর্যের আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে এবং এই দশকেও একাধিক প্রবন্ধে আলোচ্য করেছেন। তিনি মনে করেন সত্য সব সময়েই মানবিক সত্য। কারণ জ্ঞানের বাইরে সত্য নেই আর জ্ঞান থেকে জ্ঞাতাকে কখনোই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ফলে সত্য সব সময়েই জ্ঞাতা সাপেক্ষ। The Religion of Man গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সত্য সম্বন্ধে

বলেছেন— ' even the important aspect of truth dealt with by seience belong to the human universe'(২২)

'সাহিত্যের স্বরূপ' পুস্তিকাটির অন্যতম প্রবন্ধ 'সাহিত্যের মূল্য' (১৯৪১) রবীন্দ্রনাথের মানবভাবনার একটি পরিপূর্ণ ছবি আমাদের সামনে মেলে ধরেছে। তাঁর সিদ্ধান্তের গুণগত বদলকে এমন দ্বিধাহীন ভাবে তিনি এই শেষের দিকের প্রবন্ধটিতে জানিয়ে গেছেন যে পড়লে অবাক হতে হয়। তিনি বলেছেন যে সাহিত্যে সত্যের স্থান জীবনসত্যের মূল্যে। এই বইয়ের একাধিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বললেন সাহিত্যের মূল্য জীবন সত্যের প্রকাশে। জীবনের সত্য যে রচনায় বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত হয়েছে তার মৃত্যু নেই। প্রথম যৌবনে আমরা লক্ষ করি যে কেবলমাত্র কবিতার ক্ষেত্রেই নয় সবক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ছিল গীতকবির সাহিত্যতত্ত্ব। এ সময় মহাকাব্যের যে বাস্তবতা সত্যের সেই কঠিন রূপকে তিনি সাহিত্যের বিষয় বলে মেনে নিতে অনেক ক্ষেত্রেই রাজি হন নি। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদল ঘটেছে। সাহিত্যের মানবজীবনের একান্ত উপস্থিতি তাঁর এই মন বদলের অন্যতম লক্ষণ হয়ে এসেছে। ' জীবন মহাশিল্পী । সে যুগে যুগে দেশে দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলেছে। · · · জীবনের এই সৃষ্টি কার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। · · · সাহিত্যে সেখানেই জীবনের প্রভাব সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেইখানেই সাহিত্যের অমরাবতী। · · · যে রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে সে রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে না। 'চরণনখরে পড়ি দশ চাঁদ কাঁদে' এই লাইনের মধ্যে বাক্‌চাতুরী আছে, কিন্তু জীবনের স্বাদ নেই।' (২৩)

মানুষ স্বভাবতই শিল্পী। তাই তার সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিই শিল্পস্বভাব। সত্যকে শিল্পস্বভাব বলার অর্থ তাকে আস্বাদ্য বলা, সত্যকে মানবিক বলা। রবীন্দ্রনাথের যে তাৎপর্য তা উপনিষদের থেকে নতুন। তাঁর অনেকখানি জোর মানবিক সত্য এই কথটার ওপরে। সত্য সম্বন্ধে তাঁর The Religion of Man গ্রন্থে তিনি বলেছেন— 'Truth which is one with the universal being, must essentially be human.'(২৪) তাঁর মতে যা অনুভূত নয় তা সত্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে গিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সম্মিলনকে খুব বড়ো করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন— 'যুক্তি শৃঙ্খলের দ্বারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন হয় কিন্তু সাহিত্য মিলিত করে পরস্পরের হৃদয়কে। সুতরাং সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব, মানবের সহিত থাকিবার ভাব, মানবকে স্পর্শ করা মানবকে অনুভব করা।'(২৫) সাহিত্যে এই সম্মিলনের প্রভাব ইতিপূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্যে ছিল না বলা যাবে না কিন্তু এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে এর আগে পাই নি। 'সাহিত্য' প্রবন্ধাবলীর শিশুসাহিত্য প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে আমাদের অন্তঃকরণে যত কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই বৃত্তি দিয়ে যখন আমরা মুক্ত মনে সাহিত্য বিচার করব তখনই তার যথার্থ রস আমরা উপলব্ধি করব— 'গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া

বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশ চেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব ···। '(২৬) কিন্তু কেবলমাত্র এইটুকুই সাহিত্যের সম্মিলনের ক্ষেত্র নয়। যে ঐক্যের তত্ত্ব পরবর্তী পর্বে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তা আরও বিস্তৃততর ও গভীরতর।

বস্তুত পক্ষে সৃষ্টি মাত্রেই ঐক্য আছে। শাস্ত্রে আছে, এক বললেন বহু হব। নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। ঠিক এই কথাই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব প্রবন্ধে বলেছেন, আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলেছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে দিয়ে জানছি নানা ভাবে। তিনি দেখলেন কোনও সুন্দর বস্তু থেকে আমরা যে আনন্দ পাই তার কারণ সুন্দরে সুন্দরে প্রতিটি অংশের অতীত একটি সামগ্রিক ঐক্য থাকে। এই ঐক্য আমাদেরই অন্তরতম ঐক্য। সুন্দরের স্বরূপ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ যদিও বাহ্য সাংগঠনিক উপাদান গুলির মধ্যে ঐক্য কামনা করেছেন, কিন্তু সুন্দরের সার্থকতা যে একান্তই চিদ্‌গত সে কথাও মেনে নিয়েছেন। সুন্দরের উপলব্ধি আসলে আমাদের আনন্দের উপলব্ধি। মন যাতে আনন্দ পায় না তাকে সুন্দর বলে স্বীকারও করে না। সুন্দর যে আনন্দ দেয় তার কারণ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সুন্দর বস্তুতে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না, থাকে, দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ এক সুষমা। ভারতীয় আলংকারিকেরা যে রসকে কাব্যের আত্মারূপে মেনে নিয়েছে সেই রস বিষয় ও পাঠকের মধ্যে গড়ে দেয় দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ একত্ব।

আবার লেখক ও পাঠকের মধ্যে সাহিত্য ঐক্য সৃষ্টি করে— পাঠকের মানবসত্য মিলে যায় লেখকের মানবসত্যের সঙ্গে। তলিয়ে দেখলে সকল মানুষের মিলন সর্ব মানবত্বের মিলনও বলতে পারি।

' সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলাবারই জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশে।

এর থেকে বুঝতে পারি , ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।

বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হবে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে সেই মিলনকে সর্বাকালের সর্বজনের অঙ্গীকারভূক্ত করতে। ··· তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষা।'(২৭)

পর্ব-দুই : ভাষা

সুতরাং সাহিত্য প্রকাশের একমাত্র পথ অনুসরণ করতে এবার আমরা লক্ষ্য ছেড়ে পথের অর্থাৎ তত্ত্ব ছেড়ে ভাষার আলোচনায় আসতে পারি। এই পর্বের (১৯৩০-৪১) রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার অপর উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো তাঁর ভাষা ভাবনা। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'বাংলাভাষা পরিচয়' সংকলনটির প্রবন্ধগুলি ছাড়াও 'বাংলা শব্দতত্ত্ব'

বইটির বেশ কিছু প্রবন্ধ আমাদের আলোচনার অন্তর্ভূক্ত হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে অনেকটা শান্তিনিকেতন বিদ্যাশ্রমের শিক্ষাক্রমের প্রয়োজনে, কতকটা চিঠিপত্র অভিভাষণে নিজের বা অন্যের কাছে স্পষ্ট করার উদ্দেশে আর খানিকটা কেবলমাত্র আত্মগত তাগিদে বাংলা ভাষার বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় দিকের বিশ্লেষণ করেছেন। 'বাংলা উচ্চারণ' (১৮৮৫) রবীন্দ্রনাথের ভাষা বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ। ১৯০৯ সালে শব্দতত্ত্ব নাম দিয়ে গদ্যগ্রন্থাবলীর পঞ্চদশভাগে বেশ কিছু ভাষা বিষয়ক রচনা সংকলিত হয়। পরে ১৯৩৫ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামকরণ ছাড়াও কালানুক্রমিক বিন্যাসে পরিবর্তন ও কোনো কোনো প্রবন্ধের কিছু অংশ বর্জন করা হয়েছে। অবশ্য মধ্যবর্তী সময়ে রচিত বিষয় সম্পর্কিত সব রচনাই এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এরপর ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হল 'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এর প্রবন্ধগুলি। ১৮৮৫-১৯৩৮ সময়কালে বাংলাভাষার আলোচনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ শিশুপাঠ্য সহজপাঠ, ইংরাজি ও সংস্কৃত শিক্ষার সোপন গড়ে দিয়েছেন। তাই তার বাংলা ভাষা আলোচনা থেকে কেবল সমালোচক তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথকে নয় খুঁজে নিতে হবে শিক্ষাবিদ কর্মী রবীন্দ্রনাথকে।

ভাষা আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিককার প্রবন্ধগুলিতে মূলত বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োগ ও ত্রুটি, এই সকল ত্রুটির কারণ নির্ধারণ ও সংস্কৃত ভাষার সন্তান রূপে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনায় সীমাবদ্ধথাকা এই তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব ও দুর্বলতার কথাই বলেছেন। বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উল্লেখ করে তিনি তাদের উচ্চারণ প্রকৃতি ও বিকৃতি দেখিয়েছেন। এবং সেটাই যে বাঙালির ছেলের পক্ষে বাংলা বানান ভুল করার ও মুখস্থ করে মনে রাখার মূল কারণ সে যুক্তিও অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে সাহিত্যের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে অদল বদল করার অর্থাৎ সাহিত্যের দাবি অনুসারে ভাষাকে গড়ে পিটে নেওয়ার প্রধান দাবিদার ছিলেন— 'আমাদের সাহিত্য যে ভাষাবিশিষ্টতার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হইতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্যে 'সবুজপত্র' -সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন। তাঁর মত এই যে, সাহিত্য পদার্থটি আকারে সাধারণ এবং প্রকারে বিশিষ্ট এই হইলেই সত্য হয়। এ'কথা জানি।'(২৮) আকারেও সাধারণ শব্দ দুটি বোঝায় যে চলিত ভাষায় রচিত। সুতরাং সবুজ পত্রের সম্পাদক ও প্রধান লেখক উভয়ের ইচ্ছাপূরণের নজির হয়ে এল সবুজপত্র। কিন্তু এই সবুজপত্র আসার বহুপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় সাধারণ দিকটির বিস্তর আলোচনা করেছেন। 'বাংলা ব্যাকরণ'(১৯০১) প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃত ও বাংলা ব্যাকরণের ঐক্য ও অনৈক্যের একাধিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে এই খাঁটি সত্যটুকু প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে বাংলা ভাষা বাংলা ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানেন এবং পাঠকেরও একথা জানা আছে যে তিনি বৈয়াকরণ নন অর্থাৎ ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশে ভাষা বিশ্লেষণ তাঁর কাজ না। বস্তুত সাহিত্য রচনার সূত্রে বাংলা ভাষার যে সকল দুর্বলতা ও সবলতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বাংলা ব্যাকরণের অনেক দিকের বিশ্লেষণ করে ফেলেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথকে অনেক পন্ডিত ও ভাষাবিদের উদ্ধত তর্জনীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। সে সকল প্রশ্নের

জবাব সব সময় দেওয়া সম্ভব না কারণ এর অনেকটাই ছিল তাঁদের অভ্যাসের দাবি কিন্তু তবুও যতদূর সম্ভব স্থির চিত্তে ধৈর্য সহকারে এই সকল প্রশ্নের তিনি উত্তর দিয়েছেন। বিতর্ককে প্রলম্বিত করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি কেবল সকলের কাছে এই প্রস্তাব রেখেছিলেন বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের রাজযৌটক মিল ঘটানোর জন্য তিনি প্রাণপন করেছেন সকলে যেন তাঁর সঙ্গে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথকে প্রশস্ত করে। ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশ প্রশমিত করতে বৃথা বাক্য আস্ফালনে সময় অপচয় না করে। 'জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধটি ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এরই দুইমাস পূর্বে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ সভার বার্ষিক অধিবেশনে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন সেটি 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমরা 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধের নামকরণ ইংরেজি ন্যাশনাল শব্দের স্থানে জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া সাহিত্য সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্লেষকটাক্ষপাত করিয়াছেন।

'জাতি' শব্দ এবং 'নেশন' শব্দ উভয়েরই মূল ধাতুগত অর্থ এক। জন্মগত ঐক্য নির্দেশ করিবার জন্য উভয় শব্দের উৎপত্তি। আমরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণকে জন্মগত ঐক্যবশত জাতি বলি, আবার বাঙালি প্রভৃতি প্রজাবর্গকেও সেই কারণেই জাতি বলিয়া থাকি। জাতি শব্দের শেষোক্ত প্রয়োগের স্থলে ইংরাজিতে নেশন শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা, বাঙালি জাতি = বেঙ্গলি নেশন্। এরূপ স্থলে 'ন্যাশনাল' শব্দের প্রতিশব্দরূপে 'জাতীয়' শব্দ ব্যবহার করিতে বিশেষ দোষের কারণ দেখা যায় না। আমরাও তাহাই করিয়াছি। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় অকস্মাৎ অকারণে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে আমরা 'জাতীয় সাহিত্য'শব্দে 'ভর্ন্যাক্যুলার লিটরেচর' শব্দের অপূর্ব তর্জমা করিয়াছি। বিনীতভাবে জানাইতেছি আমরা এমন কাজ করি নাই। সাহিত্য যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আমোদ বা শিক্ষাসাধক নহে, তাহা যে সমস্ত জাতির 'জাতীয়' বন্ধন দৃঢ়তর করে, বাংলা সাহিত্য যে, বাঙালি জাতির ভূত ভবিষ্যৎকে এক সজীব সচেতন নাড়ি-বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বৃহত্তর এবং ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিবে— আমাদের প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের বিশেষরূপ অবতারনা ছিল বলিয়া, আমরা বাংলা সাহিত্যকে, ব্যক্তিগত রসসম্ভোগের হিসাব নহে, পরন্তু জাতীয় উপযোগিতার হিসাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দিয়াছিলাম। সভাস্থলে বক্তৃতা পাঠ করিতে হইলে শোতৃসাধারণের দ্রুত অবগতির জন্যে বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে— আমরাও বক্তৃতার বিষয় যথোচিত বিস্তৃত করিয়া বলিয়া কেবল সম্পাদক মহাশয়ের নিন্দাভাজন হইলাম কিন্তু তথাপিও তিনি আমাদের বক্তব্য বিষয়টিকে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলেন না ইহাতে আমাদের দ্বিগুণ দুঃখ রহিয়া গেল।" (২৯)

রবীন্দ্রনাথের ভাষা আলোচনায় পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ কোনো মতপার্থক্য লক্ষ করা যায় না। তবে জীবনের শেষ পর্বের কতকগুলি রচনায় তাঁর যে বিশ্বজনীন পরিচিতি সেই দায়িত্বের দাবি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লক্ষ করা যায় যেমন— ভাষা শিক্ষার সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ। এ প্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা করব।

'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষা চিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগুলির যখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY.

UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

হলো তখন তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও লেখকের কৈফিয়ৎ ব্যক্ত করেছিলেন— এই গ্রন্থে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যথার্থ বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা নয়। প্রাচীন প্রাকৃতের মতোই বাংলা প্রাকৃতে বৈচিত্র্য আছে। চাঁটগা থেকে আরম্ভ করে বীরভূম পর্যন্ত এই প্রাকৃতের বিভিন্নতা সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু কোন প্রাকৃতের রূপ বাংলা সাহিত্যে সাধারণত স্বীকৃত হবে সেই প্রশ্ন ১৯২৩ সালে সবুজপত্র পত্রিকায় আলোচিত হয়। বস্তুত এই তর্ক সূচনা হবার বহু পূর্বেই সহজে তা স্বীকৃত হয়ে গেছে। 'বাংলা নাটকে পাত্রপাত্রীদের মুখের যে বাংলা বাক্যলাপ বিনা বিতর্কে প্রচলিত হয়েছে তা পূর্ব-উত্তর অথবা পশ্চিম প্রান্তের বাংলা নয়।'(৩০) আসলে বাংলা ভাষা প্রধানত গদ্যের ভাষা যে আজও সংস্কৃতের গণ্ডী ছেড়ে সহজ মুখের কথাকে আপন করে নিতে পারছে না সেকথা রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। তার কারণও অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ করেছিলেন একাধিক প্রবন্ধে। বাংলা ব্যাকরণের সংস্কৃত ধাঁচ মানুষের অভ্যাসের সঙ্গে এমন ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে সে স্বভাবে সহজ দিকটাকে ভুলতে বসেছে। তাই সবুজপত্রের সম্পাদক যখন চলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা বলে প্রচার করবার দায়িত্ব নিলেন তখন সম্পাদকের এতোবড়ো ঝুঁকিকেও রবীন্দ্রনাথ এককথায় সাধুবাদ না জানিয়ে পারলেন না।

জীবনের গতিশীলতার প্রতিফলন যদি সাহিত্যে দেখতে চাই তাহলে তার ভাষাকে হতে হবে সচল। আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যের প্রধান দাবি ছিল অনায়াস গতি ভাষা। অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে স্বভাবের উপল বন্ধুর পথে হবে তার যাত্রা। তখন বিষয়ের তাগিদে ভাষা আপনি গড়ে উঠবে। চলিত বাংলার বিভিন্ন রূপ থাকায় ঠিক কোন্ অঞ্চলের ভাষাকে সাহিত্যের বাহন করা হবে সে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনেও দ্বিধা ছিল। এবং সবুজপত্র পর্বে তাই তিনি এ বিষয়ে সঠিক কেনো মতামত প্রকাশ করেন নি। কিন্তু শেষ পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাবে জানালেন তাঁর মত 'চলিত ভাষার রূপ' ১৯৩১ এবং 'বিবিধ'(১) ১৯৪০ নামে শব্দতত্ত্ব গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধে। কলকাতা অঞ্চলের চলতি ভাষাই সাহিত্যের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। তাহলে সাহিত্য অনায়াসে হয়ে উঠবে মানবজীবনের অঙ্গীভূত, তাদের দৈনন্দিনতার তুচ্ছতা আপন সীমার আগল খুলে অসীমের সঙ্গে মিলনের পথে গতিশীল হবে।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ, ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবে তাঁর পরিচয় যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় তা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। ' ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতির সঙ্গে আমার পার্থক্য এই যে তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোল বিজ্ঞানী আর আমি যেন পায়ে চলা পথের ভ্রমণকারী।'(৩১) এই চলার পথে যে অসংগতি তাঁর কানে বেজেছে তাকেই তিনি ফিরে দেখেছেন ও তার কারণ খুঁজেছেন। তাই তাঁর বিচারে বাংলা ভাষার প্রধান সম্পদের জায়গা হল যে বাংলা ভাষাটা ভঙ্গিওয়ালা ভাষা। একই শব্দ অন্তস্বরের পরিবর্তনে ভিন্ন অনুভূতি বহন করে। হরিকে হরে বললে সেটা সম্মানের শোনাবে না। অথচ হরু বললে তা স্নেহ বহন করে। আবার উস্‌খুস্, ফ্যাল ফ্যাল, কাচুমাচু শব্দের ধরাবাঁধা অর্থ নেই। তাদের কাছে যেন উপরি পাওনা আদায় হয়। তার কারণ অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে একটা ছন্দোময় উদাহরণ দিয়ে বাংলাভাষার ধ্বনি-প্রাধান্যটাকে বুঝিয়েছেন—

' যাব যাব করে চরণ না সরে